"জাতীয় শিক্ষানীতি – ২০২০" ---কিছু কথা

ডঃ অসীম কুমার মান্না

২৯ জুলাই,২০২০ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১৩০তম প্রয়াণ দিবস। এই দিনটা আমাদের বাঙালির জীবনে তো বটেই সারা ভারতবাসীর কাছে এক স্মরণীয় দিন। এই দিনে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় গৃহীত হয়েছে। সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বড় ধরণের সংস্কার এনেছিল ভারত সরকার। তিন দশকেরও বেশি আগে প্রণয়ন করা পুরানো জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) সংস্কার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বর্তমান সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর নতুন একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তন করার চেষ্টা শুরু করে। ২০১৬ সালের মে মাসে প্রাক্তন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি সুব্রহ্মনিয়াম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর ২০১৭ সালের জুন মাসে কস্তুরিরঙ্গনের নেতৃত্বে 'খসড়া জাতীয় শিক্ষনীতি' রচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ২০১৯ সালের ৩১ মে 'খসড়া জাতীয় শিক্ষনীতি–২০১৯' মন্ত্রীর কাছে জমা দেয়, যা গত ২৯ জুলাই,২০২০ মন্ত্রীসভার অনুমোদন পেয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি–২০২০' নামে আত্মপ্রকাশ করে।এটি ৬৬ পাতার একটি দলিল।

জাতীয় শিক্ষানীতি–২০২০ ঘোষণার পর থেকে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। প্রথম যে বিষয়টিতে আপত্তি উঠেছে সেটি হল এই অতিমারির সময়ে যখন সংসদ চলছে না, সংসদের উভয় কক্ষে আলোচনার কোনও সুযোগ নেই, বিরোধীদের মতামত দেওয়ার কোন পরিস্থিতি নেই, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন বন্ধ, কেউ বাইরে বেরোতে পারছে না, ঠিক সেই সময় এই বিষয় নিয়ে শিক্ষাবিদদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে, সংসদকে এড়িয়ে এত তাড়াহুড়ো করে জাতীয় শিক্ষানীতির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ক্যাবিনেটে পাশ করিয়ে নেওয়া হল কেন?

যদিও সরকার দাবি করেছে দেশের ৬৭৬টি জেলার ৬৬০০ ব্লকের আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দু'লক্ষ মতামত তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু মতদানকারীদের তালিকা দেখলে সন্দেহ জাগতে বাধ্য। কস্তুরিরঙ্গন রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, যাদের সাথে কথা হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে, মুখ্যত তারা হল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান, নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সংগঠন হিসাবে তাঁরা

ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ঠ ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষক সংগঠন। অন্য কোনও ছাত্র বা শিক্ষক সংগঠনের সাথে আলোচনা করা হয়নি। ভিন্ন মতের শিক্ষক–শিক্ষাবিদ–ছাত্র বা সংগঠনগুলি তাঁদের যে মূল্যবান মত কয়েক দফায় কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠিয়েছিলেন তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শিক্ষা যেখানে যুগ্ম তালিকাভুক্ত সেখানে রাজ্যগুলির মতামত না নিয়ে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে বহু রাজ্য সরকার তার প্রতিবাদও করেছে।

গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ এডুকেশনের (CABE) সভায় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী খসড়া শিক্ষানীতির উপর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের মত যখন চেয়েছিলেন তখন দিল্লি, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্য খসড়া নীতির নানা সমালোচনা করেছিল। ঐ সভায় 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ' (আরএসএ)এর তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল। কিন্তু তাদের মতামতের কোনও প্রতিফলন ঘোষিত শিক্ষানীতিতে পড়েনি। অর্থাৎ, বিরোধী মতামতকে সেভাবে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এরপর জাতীয় শিক্ষানীতির ভিতরের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই এই শিক্ষানীতি নিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচনা করা হল।

প্রথমে এই শিক্ষানীতির কিছু সাধারণ পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব যা নিয়ে বিতর্কের সেরকম কোন অবকাশ নেই।

- সবার কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।
- ২০১৮ সালের যে Gross Enrolment ratio ২৬.৩% ছিল তা ২০২৫ সালে ৫০% ও ২০৩০ সালে ১০০% এ নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
- প্রাথমিক শুধু নয়, ১৮ বছর পর্যন্ত শিক্ষার অধিকার। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব।
- ২০২৫ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৫০% স্কুল ও উচ্চশিক্ষার ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।
- ২০৩৫ সালের মধ্যে স্কুল স্তরের পড়াশোনা পাশ করার পরে অন্তত ৫০ শতাংশ পড়ুয়া যাতে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হয় তার ব্যবস্থা করা হবে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি নেওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মাবলি মেনেই তৈরি করতে হবে বেতনের পরিকাঠামো।
- হোস্টেল ফেসিলিটি বাড়াতে হবে, ন্যূনতম মেডিক্যাল ফেসিলিটি সবার জন্য ব্যবস্থা করা হবে।

এরপরে আলোচনা করা যাক যে বিষয় গুলি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি পরপর আলোচনা করা যাক। স্কুল শিক্ষা নিয়ে শুরু করা যাক। এখন সরকারি নিয়মে বিদ্যালয় স্তরে ৬ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু হয় এবং ১০+২ বা ১২ বছরে তা শেষ হয়। দশমের পর মাধ্যমিক এবং দ্বাদশের পর উচ্চমাধ্যমিক হিসাবে দু'টি বোর্ডের পরীক্ষা হয়। প্রথম শ্রেণির আগে নার্সারি বা প্রি–স্কুল, গ্রামে সরকারিভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। যদিও বেসরকারিভাবে নার্সারি স্কুল সারা দেশজুড়ে আছে। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে ১০+২ স্কুল কাঠামো বদলিয়ে ৫+৩+৩+৪ করার কথা বলা হয়েছে। এতে মোট ১২ বছরের স্কুল শিক্ষার আগে তিন বছরের প্রাক-স্কুল বা অঙ্গনওয়াড়ি ধাপ রাখতে বলা হয়েছে। ১৫ বছরের স্কুলশিক্ষাকে ভাগ করা হয়েছে ৫+৩+৩+৪ ভাগে, যেখানে ৩ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত হল পড়ুয়াদের ফাউন্ডেশনাল স্টেজ বা মৌলিক পর্যায় । ৮ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত প্রিপেটরি স্টেজ বা প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, ১১ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত মিডল স্টেজ বা মধ্যবর্তী পর্যায় , ১৪ থেকে ১৮ বছর হল সেকেন্ডারি স্টেজ বা মাধ্যমিক পর্যায় । এর ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র যা ৩–৫ বছর তাকে স্কুল–শিক্ষার মধ্যে আনা হল, তার সঙ্গে ২ বছর অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। এই হল তাদের প্রথম ৫। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী বা সহায়িকাদের উপর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা জানি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী বা সহায়িকাদের আসলে শিশু, তাদের মায়েদের দেখাশোনা ও রান্না করা খাবার দেওয়ার দায়িত্ব আছে এবং তার জন্য তাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। পুরোপুরি সরকারি কর্মী না হলেও এঁরা জনস্বাস্থ্য ও আহার সরবরাহের কাজে প্রবল চাপে থাকেন। খুবই কম টাকায় কাজ করতে হয়। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্লাস নেওয়ার জন্য যে যোগ্যতামান, তা তাঁদের থাকে না। এই পরিস্থিতিতে এঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা খুবই জটিল ব্যাপার। এর জন্য পরিকাঠামোগত বা উপযুক্ত শিক্ষকের সমস্যা যে হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু এর ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো যা এমনিতেই অর্থাভাবে ধুঁকছে সেগুলি আরও বিপর্যস্ত হবে, ফলে প্রাথমিকের

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়াশোনা ব্যাহত হবে। গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি অন্তর্ভুক্তির ফলে সরকারপোষিত বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হবে এই আশঙ্কায় বিত্তশালী পরিবারের অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেসরকারি স্কুল বেছে নেবে। ফলে এই শিক্ষানীতি প্রাথমিক শিক্ষার বিপদ ডেকে আনতে পারে।

স্কুল শিক্ষায় মাতৃভাষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা। মৌলিক শিক্ষার পরিবর্তে কর্মমুখী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন ধরুন ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কোডিং শেখানো হবে। কিন্তু সব স্কুলে সেই শিক্ষার পরিকাঠামো নেই। এই সমস্যা কিভাবে দূরীভুত হবে তার কোন নির্দিষ্ট দিশা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চার বছর সময়কে ৮টি সেমেস্টারে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু সেমেস্টার প্রথার কলেজ স্তরের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তাতে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতা যে ব্যাহত হচ্ছে তা আমরা জানি। স্কুলের বুনিয়াদী শিক্ষার বুনিয়াদটাই এর ফলে নড়বড়ে হয়ে যাবে। দশমের পর মাধ্যমিক হিসাবে যে বোর্ডের পরীক্ষা আছে এবং যে পরীক্ষায় পাশ করলে সার্টিফিকেট পাওয়া যায় তার অবলুপ্তি ঘটানো হচ্ছে। মাধ্যমিক–পাশ এ দেশে সরকারি বেসরকারি নানা চাকরি পাওয়ার একটা যোগ্যতামান। দশম শ্রেণির পর বোর্ড পরীক্ষার অবলুপ্তি ঘটিয়ে বিদ্যালয় স্তরের শেষ পরীক্ষা দ্বাদশে নিয়ে যাওয়ার ফলে দু'ধরনের বিপত্তি তৈরি হবে। দশমের পর বহু ছাত্রের 'ড্রপ–আউট' হবে এবং যারা টিকে থাকবে তাদের আরও দু'বছর অপেক্ষা করতে হবে এই শংসাপত্র পাওয়ার জন্য।

দেখা যাচ্ছে যে এই পর্বের পাঠক্রমে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য – এই তিন বিভাগ থাকছে না, বরং মূল্যায়নের পর্বে পড়ুয়া জীবনের গোড়া থেকে সেদিন পর্যন্ত যা শিখলেন সেটার পর্যায় ক্রমিক বিচারে তার দক্ষতা পরিমাপ করা হবে। শিক্ষার্থী এই পর্বে তার পছন্দের বিষয় পড়বেন। উচ্চ শিক্ষায় যেমন এখন সিবিসিএস চলছে, তেমন একটা ধাঁচে পড়ুয়া তার বিষয় বেছে নেবেন। ফলে সিবিসিএস যেমন চয়েস বেসড্ না থেকে কলেজ বেসড্ ক্রেডিট সিস্টেম হয়েছে, এটাও স্কুল বেসড্ চয়েসেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ, এর জন্য যে শিক্ষা পরিকাঠামোর প্রয়োজন তা নেই। সেই পরিকাঠামো অর্থাৎ স্কুল বাড়ি, শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষা সহায়ক উপাদান বা টিএলএম, ইত্যাদি নিশ্চিত না করে এই শিক্ষানীতির প্রয়োগ হলে, বাস্তবে জটিলতা বাড়াবে। ফলে বিষয়

বাছাইয়ে বাধ্যবাধকতাও থাকছে না বললেও সেটা থাকতে বাধ্য। এই পরিকাঠামোয় সেটা একটা অনিবার্য বিষয়।

কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে এবার থেকে স্নাতক অনার্স কোর্স তিন বছরের নয়, চার বছরের হবে । স্নাতকোত্তরে ১ বা দু'বছরের কোর্স পড়ানো হবে । এছাড়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর একসঙ্গে পড়ার জন্য ৫ বছরের একটি ইন্টিগ্রেটেড কোর্সেরও ব্যবস্থা রয়েছে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে । বর্তমানে দেশের সব একক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে বহুমুখী (মাল্টিডিসিপ্লিনারি) করে তোলা হবে। পাশাপাশি, মাল্টিপল এন্ট্রি এবং এক্সিটের সুবিধা দেওয়ার সংস্থানের কথা বলা হয়েছে নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতিতে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী চার বছর মেয়াদী স্নাতক প্রোগ্রামগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা যে কোনও সময় সহজে কলেজে ভর্তি হতে পারবে এবং বেরিয়ে যেতেও পারবে।পুরো কোর্স শেষ করতে না পারলেও পড়ুয়ার জন্য থাকছে স্বীকৃতির ব্যবস্থা। একইসঙ্গে যেখানে আগে ইঞ্জিয়ারিংয়ের মতো কোর্সের ক্ষেত্রে কোনও পড়ুয়া চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা না দিলে পাশ করার কোনও সুযোগই ছিল না, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কিছু শিক্ষা থাকলেও কোনও ডিগ্রি না পেয়ে পড়ুয়াটি আউট অফ সিস্টেম হয়ে যেত । সেখানে নয়া শিক্ষা নীতিতে মাঝ পথে পড়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে শিক্ষার মানপত্র পাওয়ারও ব্যবস্থা থাকছে । প্রথম বছর শেষ করলে পড়ুয়া পাবে সার্টিফিকেট। দ্বিতীয় বছর শেষ করতে পারলে পাবে ডিপ্লোমা, তিন বছর কোর্সের পরে একরকম ডিগ্রি সার্টিফিকেট ও চার বছর অধ্যয়ন শেষে একটি বহুমাত্রিক (মাল্টি ডিসিপ্লিনারি) স্নাতক ডিগ্রি দেওয়া হবে। অনেক পড়ুয়া অনেক অসুবিধার কারণে মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরে কোর্স কমপ্লিট করতে চাইলে তার সুযোগ থাকে না । জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ অনুসারে, স্নাতক না স্নাতকোত্তরে এক বা একাধিকবার বিশেষ শর্তে কোর্স ভেঙে পড়ার সুযোগ থাকছে । কোনও পড়ুয়া মাঝপথে পড়া বন্ধ করার বা পরীক্ষা না দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে এসে চাইলে কোর্স কমপ্লিট করতে পারে । সেক্ষেত্রে তাঁকে প্রথম থেকে পড়া শুরু করতে হবে না । এর জন্য প্রত্যেক পড়ুয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অ্যাকাডেমিক ডিজিলকারের ব্যবস্থা করবে কেন্দ্র। এতদিন ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত পড়ে কেউ পড়া ছেড়ে দিলে তাকে উচ্চ মাধমিক পাশ ধরা হত। এখন থেকে সেও একটা সার্টিফিকেট পাবে। পছন্দমতো বিষয় বেছে নিতে পারবেন পড়ুয়ারা। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন নিয়ে পড়লেও, ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়ার সুযোগ থাকবে। এক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণধর্মী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় জোর দিতে চাইছে

সরকার। অর্থাৎ, ডিগ্রির পর পড়ুয়াদের শিক্ষা অনুযায়ী জীবিকা পেতে যাতে কোন অসুবিধে না হয়। নতুন শিক্ষানীতির লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির চাপ কমানো, আরও বেশি বহুমাত্রিক করে তোলা। আগের মতো কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে কঠোর পার্থক্য করা হবে না। সামগ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে আইআইটিগুলোকে (ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজি) প্রয়োজনে ২০৪০ সালের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে কলা ও মানবিক বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আগামী পৃথিবীর ভূ-প্রাকৃতিক, সামাজিক চাহিদা, অর্থনীতির পরিবর্তিত কাঠামোর সঙ্গে তাল রেখে জীবন জীবিকার ধরনও বদলে যাবে। পৃথিবীতে তরুণ নাগরিকের সংখ্যা আমাদের দেশেই সর্বাধিক হবে। সেই বিপুল সংখ্যার তরুণকে সময়ের প্রয়োজন অনুসারে যোগ্য করে তুলতে হলে গতানুগতিকতা থেকে বেরোতে হবে। সেদিক থেকে এটি একটি সদর্থক দিক।

আর একটি যে বিষয়ে এই শিক্ষানীতি বেশী সমালোচিত হচ্ছে তা হল এই নীতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এই নীতিতে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ নাম বদলে হয়ে গেল শিক্ষা মন্ত্রক। অর্থাৎ, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের তিরোধান, আর শিক্ষা মন্ত্রকের আবির্ভাব হল। ল' এবং মেডিক্যাল ছাড়া বাকি সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাতার তলায় আসতে চলেছে। সরকারি এবং বেসরকারি নির্বিশেষে সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন রেগুলেশন চালু হবে। উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে ‘ইউজিসি’, ‘এআইসিটিই’ এবং ‘এনসিটিই’-এর মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির অবলুপ্তি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে এডুকেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (এইচইসিআই)বা ‘হেকি’ গঠন করা হবে।তিন হাজার বা তারও বেশি শিক্ষার্থী থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বেশি মনোযোগ দেবে এই কাউন্সিল। এর চারটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকবে-ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশন রেগুলেটরি কাউন্সিল, জেনারেল এডুকেশনাল কাউন্সিল, হায়ার এডুকেশন গ্রান্টস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল এক্রিডিটেশন কাউন্সিল। এভাবে সরকারি ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আরও বৃদ্ধি করার একটা সুযোগ রাখা হল। এতে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এটি প্রায় নিশ্চিত।

এই নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষার উন্নতিকল্পে যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষা ক্ষেত্রে জিডিপির ৬ শতাংশ লগ্নি করবে সরকার।এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপি-র ৪.১৪ শতাংশ

অর্থ খরচ হয়েছিল। ২০২০-২১ সালে বরাদ্দ কমে হয়েছে ৩.২ শতাংশ। তার মধ্যেই কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ থেকে ৪০ শতাংশ টাকা কাটছাঁট হতে চলেছে। অর্থাৎ, শিক্ষায় আসলে খরচ হতে চলেছে জিডিপি-র ২ শতাংশ। ফলে শিক্ষাখাতে জিডিপি-র ৬ শতাংশ অর্থ কী ভাবে আসবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এই শিক্ষানীতি 'বহুত্ববাদিতা', 'বৈচিত্র্য' প্রভৃতি শিক্ষায় পড়ুয়াদের শিক্ষিত করে তুলবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অথচ এই কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতেই তাঁরা বহু জাতি, বহু ভাষাভাষী, বহু সংস্কৃতির দেশে এক পাঠ্য–বিষয়, এক পরীক্ষা, এক প্রবেশিকা পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। এক দেশ, এক ভাষা, এক আইন কার্যকরী হলে যেমন সামাজিক বৈচিত্র্য বাধাপ্রাপ্ত হবে, তেমন সামাজিক রীতিগুলো (যা আইনের উৎস) গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির যোগসূত্রকে বজায় রাখতে একমুখী কেন্দ্রীকরণের জাঁতায় ফেলাটা ঠিক হবে না।এতে ভারতের যে ঐতিহ্য 'বৈচিত্র্যের মধে ঐক্য' তা বিঘ্নিত হবে। 'ন্যায়ের ভিত্তিতে সকলের জন্য সমমানের শিক্ষা প্রদান' জাতীয় শব্দগুলি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য–লক্ষ্য হিসাবে ছত্রে ছত্রে উল্লেখ আছে। অন্য দিকে সরকার নিজেই তিনটি অসম মানের বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করবে– প্রথমটি গবেষণাকেন্দ্রিক, দ্বিতীয়টি কেবল শিক্ষণের জন্য এবং তৃতীয়টি ডিগ্রি প্রদানকারী অটোনমাস কলেজ স্তরের– যার ফলে চূড়ান্ত বৈষম্যের শিকার হবে পড়ুয়ারা।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষক–ছাত্র পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিচালিত **শ্রেণি–কক্ষ শিক্ষার পরিবর্তে অনলাইন শিক্ষার** উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ৫০ শতাংশর বেশি পড়ুয়াকে সেই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করবে বলে সরকার পরিকল্পনা করেছে। এমনকি ১০০ শতাংশ অনলাইন শিক্ষা ভিত্তিক স্নাতক–ডিগ্রি প্রদানের কলেজ খোলার অনুমতি দেওয়া হবে বলা হচ্ছে। কম্পিউটার–ল্যাপটপ ভিত্তিতে এই শিক্ষা প্রদান করা হবে। অনলাইন শিক্ষার 'অ্যাপ' থাকবে অথবা পাঠদানরত শিক্ষকদের লেকচারের ভিডিও থাকবে যা ইন্টারনেট সম্পন্ন কম্পিউটার–ল্যাপটপে পাওয়া যাবে। তা শুনে পড়াশোনা হবে। ডিজিটাল লার্নিংয়ে গতি আনার জন্য National Educational Technology Forum গঠিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে Open Distance Learning (ODL) এবং অনলাইন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা থাকবে। আঞ্চলিক ভাষায় ই-কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষাদান, মূল্যায়ন, এবং শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকবে প্রযুক্তির ব্যবহার। ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ আনন্দ বাজার

পত্রিকার একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার এত বছর পরেও গ্রামের বহু পড়ুয়া অনলাইন পাঠের সুবিধা পায়নি। অতিমারীতে স্কুল বন্ধ থাকায় অ্যাক্টিভিটি টাস্কের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। মিড ডে মিলের চাল, আলু বিলির দিন অভিভাবকদের হাতে প্রশ্নমালা দেওয়া হয় এবং পরের মিড ডে মিল বিলির দিনে তা জমা দিতে বলা হয়। দেখা গেছে খুব ভালো কিছু পড়ুয়া বাদে বাকিদের অবস্থা খুব খারাপ। কেউ সহায়িকা বই থেকে হুবহু উত্তর টুকে দিয়েছে, কেউ কেউ উত্তর না লিখে প্রশ্নের পাশে বইয়ের পাতার সংখ্যা লিখে দিয়েছে, অনেকে কিছু বুঝতে না পেরে ফাঁকা খাতা জমা দিয়েছে, অনেকে খাতা জমাই দেয়নি। মধ্যমেধা বা নিম্নমেধা পড়ুয়াদের নিয়েই এই বিশেষ সমস্যা। সবাই যে অসাধু উপায় অবলম্বন করতে চায় তা নয়, বুঝতে না পেরে তারা একাজ করেছে। গ্রামাঞ্চলে অনেকে প্রথম জন্মের পড়ুয়া, অভিভাবকেরা লেখাপড়া না করায় ওদের দেখিয়ে দেওয়ার কেউ নেই, টিভি দেখে ক্লাসের সুযোগও নেই সকলের। অ্যাক্টিভিটি টাস্কের এই বিচিত্র ছবি শিক্ষা শিবিরের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। শিক্ষার বিষয়ে সদ্য প্রকাশিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী, আমাদের এই রাজ্যের মাত্র ৯.৪% পরিবারের কম্পিউটার রয়েছে, মাত্র ১৬.৫% পরিবারের কাছে ইন্টারনেটের সুবিধা রয়েছে, দেশের মাত্র ১০.৭% পরিবারের কাছে কম্পিউটার এবং মাত্র ২৩.৮% পরিবারের কাছে ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা রয়েছে। দিল্লি, কেরল, হরিয়ানা ও পঞ্জাবের মত হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে বাকি সব রাজ্যের অবস্থা করুণ। কিছুদিন আগে সিবিএসই স্কুল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এর জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক, অভিভাবকদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়ে ছিল শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ এন সি আর টি। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ২৭% পড়ুয়া ল্যাপটপ কিংবা স্মার্ট ফোন হাতে পাচ্ছে না। ২৮% পড়ুয়া ইন্টারনেট সংযোগ, এমনকি বিদ্যুতের ঘাটতির জন্যেও সমস্যায় পড়ছে। ভারতের মত দেশে যেখানে অনেক গ্রামে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, সেখানে অনলাইন শিক্ষার ব্যবস্থা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তাছাড়া কম্পিউটার–ল্যাপটপ বা স্মার্টফোন কেনার মত আর্থিক সামর্থ্য কতজনের আছে?যদি কম্পিউটার–ল্যাপটপ সবার থাকেও তাতেও কি আমরা দীর্ঘদিনের প্রচলিত ও সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক–ছাত্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন শিক্ষাকে বিকল্প হিসাবে বেছে নিতে পারি? অনলাইন শিক্ষা শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক মূলধারা শিক্ষার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা তার বিকল্প হতে পারে না। 'শিক্ষাবিধি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে ... প্রাণের

দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, ... গুরু–শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষা কার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মত চলিতে পারে''। যে অনলাইন শিক্ষার ওপর এই নীতি জোর দিয়েছে তাতে প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রই হল 'গুরু' বা শিক্ষক। প্রশ্ন হল যন্ত্র কি কিশোর মনে 'প্রাণ সঞ্চার' করতে পারবে? 'গুরু–শিষ্যের আত্মীয়তার' সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে? তাদের মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে পারবে? মননশীলতা সৃষ্টি করতে পারবে? না যন্ত্র কেবল 'রোবোটিক' কিছু মানুষের জন্ম দেবে? ফলে কম্পিউটার ইত্যাদি কেনার আর্থিক সামর্থকে ভিত্তি করে যে 'ডিজিটাল ডিভাইস' তার ফলে দু'ধরনের ছাত্রের সৃষ্টি হবে। এখানে স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হবে না, লাইব্রেরি–ল্যাবরেটরি তৈরি করতে হবে না, শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে না। ফলে সরকারের আর্থিক দায়িত্ব হয়ত অনেক কমবে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতির আসল উদ্দেশ্য তাতে ব্যাহত হবে। বিত্তশালীরা ছাড়া অন্যরা এই শিক্ষা পাবে না। এই যন্ত্রের অভাবে লকডাউনের সময়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু পড়ুয়া ও অভিভাবক আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন।

এই শিক্ষানীতিতে M.Phil কোর্স অবলুপ্তির কথা বলা হয়েছে।এমফিল হল গবেষণার একটা প্রাথমিক ধাপ। এটিকে মুছে ফেলে গবেষণার বিস্তৃতি কিভাবে ঘটবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বিতর্কের ঝড় সামলাতে প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসেছেন।গত ৭ই আগস্ট, ২০২০ 'কনক্লেভ অন ট্রান্সফরমেশনাল রিফর্মস ইন হায়ার এডুকেশন আন্ডার ন্যাশনাশ এডুকেশন পলিসি' শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় ভাষণ দেন তিনি। এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্কুল পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন, এমফিল বন্ধ-সহ শিক্ষাপদ্ধতির বদল নিয়ে ব্যাখ্যা দেন তিনি।

মোদী বলেন, "নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। এই বিতর্ক স্বাস্থ্যকর বিতর্ক। এই বিতর্ক দেশের শিক্ষার জন্যই লাভবান হবে। চিকিৎসক, ইঞ্জনিয়ার বানানোর দৌড় থেকে শিক্ষাকে বার করতে হবে"। শিক্ষাবিদদের পাশে তিনি আছেন বলেও আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার পর থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা অব্যাহত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বারবার অভিযোগ তুলেছে, আলোচনা না করে এককভাবে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করছে কেন্দ্র। এভাবে শিক্ষা বিষয়টিকে কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, এই অভিযোগও

Society Language C

শোনা গিয়েছে। এমনকী এ রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষামহলের বিশিষ্টজনেরাও নয়া শিক্ষানীতির সমালোচনা করেছেন।

তীব্র বিরোধিতার মুখে নতুন শিক্ষানীতি কার্যকরের ভার আর এককভাবে নিজেদের হাতে রাখতে চাইছে না কেন্দ্র। গত ২১শে আগস্ট, ২০২০ কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব অনিতা কারওয়াল রাজ্যের স্কুল শিক্ষাসচিবদের চিঠি পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন, নতুন শিক্ষানীতি কার্যকরের ব্যাপারে তাঁদের পরিকল্পনা কী। সচিব ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের প্রিন্সিপাল, শিক্ষকদের মতামতও গ্রহণ করা হবে। কারণ, শিক্ষকরাই যে মূল কাজটা করবেন, তেমনটাই মনে করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক (Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank)। ৩৪ বছর পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে ফেলার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সকলের সাহায্য চান তিনি।

৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ সব রাজ্যের রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীদের জন্য শিক্ষানীতি সংক্রান্ত ভিডিও-আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নীতিকে কার্যকর করার আগে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যেক রাজ্য-সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের লাগাতর আলোচনা চান তিনি, যাতে এ বিষয়ে ধোঁয়াশা কাটে, দূর হয় অমূলক আশঙ্কা। নীতি রূপায়নে কেন্দ্র রাজ্যকে হাত মিলিয়ে এগোতে হবে, তাঁর বক্তব্য, "এটি কোন সরকারের নীতি নয়, প্রতিরক্ষা বা বিদেশনীতির মত দেশের একটি নীতি"। বৈঠকে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জানিয়েছেন, "শিক্ষা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকাভূক্ত, তাই শিক্ষানীতির সফল প্রয়োগের জন্য তাদের মধ্যে যোগাযোগ, সমন্বয় জরুরি"। এখানেই বিরোধীদের প্রশ্ন, তা হলে সংসদকে এড়িয়ে এই অতিমারীর সময়ে এত বড় সংস্কারের পথে কেন হাঁটল সরকার? এত তাড়াহুড়ো কিসের জন্য? শিক্ষানীতি ঘোষণার পরে তা নিয়ে আলোচনায় যত আগ্রহ কেন্দ্রের নীতি ঘোষণার আগে তা দেখালে ভুল-ত্রুটি, সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেত, সুযোগ থাকত সংশোধনের। আমাদের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ভিডিও-আলোচনায় উপস্থিত থেকে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার তালিকায় আনার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "বাংলা ভাষায় যে বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার, যে ঐতিহ্য রয়েছে, যে ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত রচনা হয়েছে, তাকেই বাদ দেওয়া হয়েছে"।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক (Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank) জানিয়েছেন, এই নীতি কার্যকর করার সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরী, তবু সবার সঙ্গে আলোচনা চান। এজন্য শীঘ্রই প্রত্যেক রাজ্যকে পাঠানো হবে ৩০০ টি বিষয়ের তালিকা। যার ভিত্তিতে আলোচনার পরে তৈরি করা হবে বাস্তবায়নের চূড়ান্ত নির্দেশিকা। তাই চূড়ান্ত জাতীয় শিক্ষানীতি পাওয়ার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

তথ্য সূত্রঃ-

1. www.banglaquiz.in July31, 2020

2. www.mhrd.gov.in জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া ২০১৯

3. www.peoplesreporter.in August 2, 2020

4. bn.vikaspedia.in জাতীয় শিক্ষানীতির রূপরেখা

5. bengalinews18.com National education policy 2020, July 29, 2020

6. www.anandabazar.com August6, 2020

7. eisamay.indiatimes.com July30, 2020

8. আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৭ই এবং ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২০।

Society Language and Culture